বিমল সিংহের উপন্যাস *লংতরাই*: প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ

ছন্দম চক্রবর্তী

কাহিনিবিন্যাস

উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম রাজ্য ত্রিপুরায় লঙতরাই পাহাড়ের কোলে রিয়াং জনপদ গলাছড়া। সেখানে তরুণ জরকামুনির বাস। পাহাড়জুড়ে যে জঙ্গলের বিস্তার সেই অরণ্যের উপর নির্ভর করেই যুগ-যুগ ধরে বয়ে চলে রিয়াংদের জীবন। আধুনিক যাপন থেকে দূরবর্তী আদিবাসী রিয়াংদের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি আবর্তিত হয় অরণ্যকে কেন্দ্র করে। রিয়াং সমাজের অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন জুম চাষ। পাহাড়ের কোলে অরণ্য কেটে এই চাষে শারীরিক শ্রমে সমর্থ নারী-পুরুষ সকলেই বৃত। এই জুম ক্ষেতেই যুবক জরকামুনির সঙ্গে দেখা হয় যুবতী সাজেরুঙের। শুরু হয় মন দেওয়া-নেওয়া। আদিম সমাজে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম গোষ্ঠীর দ্বারা প্রতিহত হয় না। বরং সেই প্রেমের বিকাশে সহজ পরিসর দেয় সমাজ।

কিন্তু রিয়াং গোষ্ঠীর জীবন প্রতিকূলতায় ভরা। জীবন যেহেতু প্রকৃতি-নির্ভর, তাই জ্যৈষ্ঠ মাসে পাহাড় জুড়ে দেখা দেয় অভাব। অন্নের ভাঁড়ার ফুরোয়, ফুরিয়ে যায় মুরগি-শুয়োরের মতো গার্হস্থ্য সম্পদ। কচুসেদ্ধ, কাঁঠাল বিচি, থাইথয় ফল, বুনো আলু খেয়ে দিন কাটে রিয়াংদের। তাও রোজ জোটে না। ফলে দিন কাটে অনাহারে। 'জরকামুনির বুকের পাঁজর গোনা যায়।' উত্তরে আসাম-আগরতলা রোডের মেরামতিতে সরকারি কাজ জুটতে পারে কিন্তু তার জন্য যে ঘুষ দিতে হবে তা তাদের সাধ্যের অতীত। আর ঘুষ দিয়ে চাকরি পেলেও মাইনে তো মাসকাবারি। মাঝের দিনগুলো বেঁচে থাকাই অসম্ভব। সুতরাং বেঁচে থাকার তাগিদে প্রকৃতির কাছেই ফিরতে হয় রিয়াংদের। বাঁশ-কাঠ-পাথরের পসরা সাজিয়ে বসে থাকে পাহাড়-জঙ্গল। পাথরের খাঁজে থাকে কাঁকড়া-চিংড়ি। 'যারা দেখে শুনে চিনে জেনে আনতে পারে তারাই বাঁচে।' জরকামুনির বাবা রংকারায় পাথর সংগ্রহ করতে গিয়ে পাহাড় থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। চিকিৎসা করে রিয়াংদের পুরোহিত বা অচাই। অচাই তলবাংহার গাছ-পাতার রস আর তন্ত্রমন্ত্র-ঝাড়ফুঁক সহযোগে চিকিৎসাই লংতরাই পাহাড়-জুড়ে অসুস্থ-পীড়িত রিয়াংদের একমাত্র ভরসা।

ইতিমধ্যে ফরমান জারি করে বনদপ্তর – লংতরাইয়ে জুমচাষ নিষিদ্ধ। জঙ্গলের গাছ-বাঁশ-ছন কাটাও নিষেধ। কাটতে গেলে বনকর্মীরা দা-কুড়ুল কেড়ে নেয় জুমিয়াদের। তসীরামকে তো গ্রেপ্তার করে চালান করল কোর্টে। জুমের ফসল মহাজনের কাছে বন্ধক দিয়ে তবে জামিনের টাকা জোগাড় করা গেল। বাঁশ কেটে রাবেহারিয়াঙের একমাসের জেল হলো। সুস্থ হলেও রংকারায়ের ভারি কাজের শক্তি নেই। জঙ্গলে উদাল গাছের বাকল আনতে গিয়ে একদিন সে ধরা পড়ে বনকর্মীদের হাতে। বাকলে বেঁধে তাকে চালান করা হয় রাঙ্গাছড়া বন অফিসে, চলে নৃশংস অত্যাচার। অনাহারে অর্ধমৃত বাবার উপর অত্যাচারের খবর পেয়ে জরকামুনি উদ্‌ভ্রান্ত। টাকা ছাড়া বন অফিসে গিয়ে কোনও লাভ নেই। কিন্তু কোথায় টাকা পাবে সে। হতবুদ্ধি জরকামুনি যায় হাসমাই রিয়াঙের কাছে। রিয়াং সমাজে ব্যতিক্রমী হাসমাই লেখাপড়া জানা মানুষ। গরীব মানুষদের সে নানাভাবে সাহায্য করে। সরকারি জোরজুলুমের বিরুদ্ধে তাদের সংগঠিত করে। হাসমাই লম্বাছড়া, জহরনগর প্রভৃতি কলোনির গরীব বাঙালীদেরও জড়ো করে। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় তারা জানে, মহাজন-ঠিকাদারেরা গাছ কেটে অরণ্য ফাঁকা করে দিলেও বনদপ্তর রা কাড়ে না। অথচ তাদের যত জুলুম গরিব মানুষের উপর। হাসমাইয়ের নেতৃত্বে জোটবদ্ধ মানুষ পা বাড়ায় বনদপ্তরের দিকে। তাদের 'রুক্ষ সব পায়ের পেশীতে নতুন সঞ্জীবনের ধ্বনি। হতাশা দুমড়ানো বুকের গভীরে ঢেউ-এর মতো আঁছড়ায় এক নতুন বিশ্বাসে।' কিন্তু বনরক্ষীদের অতর্কিত আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয় জনতা। নৃশংস লাঠির আঘাতে রক্তে ভেসে যায় হাসমাইয়ের মুখ। একদিকে প্রকৃতির রুদ্র মূর্তি, অন্যদিকে

সরকারি নিয়মের শ্বাসরোধী বেড়াজাল – উভয়ের সামনে অসহায় গরীব মানুষ প্রথমবার রাষ্ট্রের দমনপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। নিয়ন্ত্রিত জুমের অধিকার ফিরে পায় রিয়াংরা।

কিন্তু জুমের কাজে যে অর্থের প্রয়োজন তা তাদের নেই। বাধ্য হয়ে জরকামুনিকে হাত পাততে হয় মহাজনের কাছে। মহাজনের শর্তগুলি কঠিন। জ্যৈষ্ঠ মাসে দুশো টাকা নিলে কার্তিক মাসে তিনশো টাকা ফেরত দিতে হবে। সুদের হার অভাবনীয়: বার্ষিক শতকরা একশো কুড়ি টাকা। শুধু তাই নয়, টাকা শোধের জন্য জামিন রাখতে হয় গ্রামের সর্দারকে; তাকেও দিতে হয় ঘুষ। এই সময় 'সারা বাজারে রিয়াংদের ভিড়। অধিকাংশেরই চোখ কোটরাগত। বুকের পাঁজরের সবগুলি হাড় টেনে বেরিয়ে আসছে।... কেউ এসেছে ঋণ নিতে। কেউ আসে বাজারে গলার রূপার মালা বেচতে বা বন্ধক দিতে। কেউ এসেছে ঘরের একমাত্র সম্পদ শুয়োর বা মোরগটা বিক্রি করতে।' আমবাসা বাজারে আসার সময় জরকামুনি দেখে এসেছে, 'সাজেরুঙ-এর উপোসী মুখখানি'। কার্তিক মাসে ফসল উঠলে মহাজনের কাছে ফসল বেচে শোধ করতে হয় সুদসহ তাঁর ঋণ। ওজনে ঠকায় মহাজন, তবু মেনে নিতে হয়। এত বঞ্চনা ও প্রতারণার পরেও ঘরে সঞ্চিত পরিশ্রমের ফসল সামান্য সচ্ছলতার সঙ্গে রিয়াংদের জীবনে নিয়ে আসে আনন্দের মুহূর্ত। বস্তুত সরলপ্রাণ এই আদিবাসীরা জীবনে যাবতীয় দুঃখ ও বিপর্যয়ের পরতে-পরতে সযত্নে রক্ষা করে আনন্দের নানা উপলক্ষ। লক্ষণীয়, কৌম সংস্কৃতির ঐতিহ্যানুসারে আনন্দের এই মুহূর্তগুলিকে তারা উদ্‌যাপন করে যৌথভাবে। ছড়ায়-প্রবাদে-সংগীতে, বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগে আমরা দেখি তাদের জীবনচর্যায় লোকসংস্কৃতির এক সজীব প্রাণপ্রবাহ। আর্থিক সচ্ছলতার এই মুহূর্তে রংকারায় উদ্যোগী হয় সাজেরুঙের সঙ্গে জরকামুনির বিয়ে দিতে। সম্বন্ধ নিয়ে খোয়াই নদীর পারে গভীর অরণ্যের মাঝে খমুপাড়ায় পৌঁছায় রংকারায়রা। রিয়াং রীতি অনুসারে বিয়ে হয় জরকামুনি ও সাজেরুঙের। তারপর এক ভিন্ন জীবনে প্রবেশ করে জরকামুনি। তার সঙ্গে খমুপাড়ার পটে এক ভিন্ন পরিসরে প্রবেশ করে এই আখ্যান।

নতুন বিবাহিত জীবন জরকামুকির কাছে সার্থক স্বপ্নের মতো। কিন্তু একই সঙ্গে চিন্তার, কারণ আগামী তিনবছর শ্বশুরবাড়িতেই কাটাতে হবে জরকামুনিকে। পালন করতে হবে সমস্ত সাংসারিক দায়দায়িত্ব। এই 'জামাইখাটা' রিয়াংদের সামাজিক প্রথা। কিন্তু এই প্রথা পালন করা সহজ নয়। 'জরকামুনি ভাবতে পর্যন্ত ভয় পায়। সাজেরুঙকে পাওয়ার সুখ ছাপিয়ে এই ভাবনা তাকে বিহ্বল করে তুলেছে। তার মা বাপ কী করে এই তিন বছর কাটাবে?' বাস্তবিক নবীন দাম্পত্যের তীব্র সুখ দ্রুত স্তিমিত হয়ে আসে। সাংসারিক দায়িত্ব আর পরিশ্রম গ্রস্ত করে, ক্রমশ ক্লান্ত করে জরকামুনিকে। কখনও শান্তি কখনও ঝগড়া – সাংসারিক পরিসরে আর পাঁচজন মানুষের মতোই আনন্দ-বেদনার ক্রমান্বয় ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে এগোতে হয় তাকে। ইতিমধ্যে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে রিয়াংদের ঘরে-ঘরে ঘনিয়ে আসে দারিদ্র্যের ঘন ছায়া। কাজ নেই, তাই হাতে অর্থ নেই। সাজেরুঙ গর্ভবতী। এরই মধ্যে অসুখে শয্যাশায়ী সাজেরুঙের বাবা কৌরেঙফা। তলবাংহাকে দিয়ে কৌরেঙফার চিকিৎসা আর সাজেরুঙের প্রসবের জন্য বিক্রি করে দিতে হয় সাজেরুঙের রুপোর মালা। তাই সাজেরুঙের ছেলে হলে তার নাম রাখা হয় রাংথাংহা, রিয়াং ভাষায় যার অর্থ রূপাহারা।

এই বিপদ ক্রমশ বিপর্যয়ের আকার নেয় খমুপাড়ায় মহামারীর মতো আন্ত্রিকের আক্রমণে। একের পর এক মানুষ মরে, মারা যায় কৌরেঙফা। তলবাংহার পুজো-আচ্চা, মন্ত্র-তন্ত্র কোনওকিছুই আটকাতে পারে না মৃত্যুর মিছিল। বিয়ের দুবছরের মাথায় এক অভাবনীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি জরকামুনি। 'নিজের গ্রাম গলাছড়া ছিন্ন ভিন্ন।' বেঁচে থাকার চেষ্টায় লোকজন নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ভেঙে গেছে জরকামুনির পরিবার। ইতিমধ্যে মারা গেছে তার বাবা-মা দুজনেই। বড়ভাই চলে গেছে অন্যত্র। গলাছড়ায় যাবার উপায় নেই। আর খমুপাড়ায় 'মৃত্যু পাগলা নেকড়ের মতো প্রতি রাত্রে হানা দেয়।' মৃত্যুর সংখ্যা পঁচিশ ছাড়িয়েছে। পাড়ার লোকেরা ঠিক করে এই অভিশপ্ত জায়গা ছেড়ে চলে যাবে তারা। যাবে এমন এক জায়গায় যেখানে পাহাড় ও অরণ্য আছে,

আছে জুম চাষ করে জীবিকানির্বাহের আশ্বাস। সেই জায়গার খোঁজে এই মৃত্যুপুরী থেকে ছেলে-বউ নিয়ে আসামের হাইলাকান্দির দিকে রওনা হয় জরকামুনি।

দু-বছর পর আমরা দেখি আসামের জঙ্গল ঘুরে ফিরে আসছে জরকামুনি। মনের মতো না হলেও হাইলাকান্দি মহকুমায় লঙ্গাই নদীর উপত্যকায় ঘাসমুড়া গ্রামের পাশে এক জঙ্গল সে দেখেছে। চাইলে সেখানেই যেতে পারে খমুপাড়ার লোক। কিন্তু ধর্মনগর থেকে ফেরার পথে কুমারহাটে তার সঙ্গে দেখা হয় হাসমাই রিয়াঙের। হাসমাই তাকে এক ভিন্ন জগতের সন্ধান দেয়। হাসমাই তাকে বোঝায় জঙ্গল-নির্ভরতা রিয়াংদের ভবিষ্যৎ নয়। মানুষ যেমন সময়ের সঙ্গে বদলায়, মানুষের জীবনও তেমনই এক জায়গায় থেমে থাকে না। তাই যুগবাহিত জঙ্গল-নির্ভরতা, জুম চাষ থেকে জরকামুনিদের বেরিয়ে আসতে হবে। হাসমাই জানায় জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে গলাছড়ায় তৈরি হচ্ছে উপনগরী। যারা চলে গিয়েছিল গলাছড়া ছেড়ে, তারা ফিরে আসছে একে-একে। হাসমাইয়ের সঙ্গে রাঙাছড়া ফরেস্ট অফিসের সামনে দিয়ে নতুন রাস্তা ধরে গ্রামের দিকে এগোয় জরকামুনি। সরকারি পরিকল্পনায় রাবার চাষ রিয়াংদের মুক্তি দিয়েছে জুম চাষ থেকে। পাহাড়ী ঝোড়ায় বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরি করে চলছে মাছচাষ। সরকারি সমবায়ে সঠিক ওজন ও দামে তিল-কার্পাস বিক্রি করতে পারে আদিবাসী-বাঙালি নির্বিশেষে গরীব মানুষ। সরকারি দোকান থেকে সস্তায় কিনতে পারে তেল-নুন-সুটকি-সুতো-কাপড়। কোথাও নেই মালিক-সর্দার-মহাজনদের দাপট। জরকামুনি অবাক হয়ে দেখে নতুন তৈরি হাসপাতাল, অচাইয়ের তন্ত্রমন্ত্র নয়, মানুষ সেখানে পায় পাশ-করা সরকারি ডাক্তারের আধুনিক চিকিৎসা। এমনকী গরু-শুয়োর-মুরগিদের জন্যেও তৈরি হয়েছে নতুন পশু হাসপাতাল। বাড়ি-বাড়ি পরিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। আর তৈরি হয়েছে চিরকালের নিরক্ষর রিয়াং শিশুদের জন্য ইস্কুল। আদিম জনগোষ্ঠীর পশ্চাদ্‌পদ যাপন থেকে আধুনিক জীবনচর্যায় পদার্পণের এই মহাযজ্ঞ মুগ্ধ করে জরকামুনি ও সাজেরুঙকে। কোলের সন্তানটির জন্য স্বপ্নের এক উন্নত পৃথিবী যে নেহাৎ অসম্ভব নয়, এই বোধ আচ্ছন্ন করে রাখে তাদের – 'রঙিন স্বপ্নের ঘোরে বিভোর তখন সাজেরুঙ। চোখে যেন দীপ্ত হয়ে ভাসছে অনাগত ভবিষ্যতের ছবি।' একটি সারণির সাহায্যে এই কাহিনিকে নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করা যায়:

সারণি ১

পটভূমি	পর্ব সংখ্যা	ঘটনাবিন্দু	জরকামুনি সক্রিয় / নিষ্ক্রিয়
গলাছড়া	১	জরকামুনি ও সাজেরুঙের সাক্ষাৎ তথা প্রেম	সক্রিয়
	২	জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে রিয়াংদের জীবনে অন্নাভাব ও অর্থাভাব	নিষ্ক্রিয়
	৩	বনদপ্তর দ্বারা জুমের অধিকার হরণ, রংকারায় গ্রেপ্তার, প্রতিবাদ	নিষ্ক্রিয়
	৪	মহাজনের ঋণে জুমচাষ, সামান্য আর্থিক সাচ্ছল্য	সক্রিয় (স্পষ্ট নয়)*
খেমুপাড়া	৫	বিবাহের পর সুখে-দুঃখে শ্বশুরবাড়ির দায়িত্বপালন	সক্রিয়
	৬	মহামারীতে খমুপাড়ায় মৃত্যু, সামাজিক বিপর্যয়	নিষ্ক্রিয়
	৭	আসাম থেকে ফিরে নতুন জীবনের সন্ধান লাভ	নিষ্ক্রিয়

* **স্পষ্ট নয় কারণ মহাজনের কাছে ঋণ করার পর জরকামুনিই যে মেহনত করে জমিতে ফসল ফলায়, ঋণ শোধ করে এবং উদ্বৃত্ত ফসলে সাংসারিক সচ্ছলতা তৈরির ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে, সে-কথা বলাবাহুল্য। কিন্তু সেই সক্রিয়তার কোনও বিবরণ এই পর্বে নেই। ফলত, এই সক্রিয়তা পরোক্ষ, তা অনুমিত।**

উপন্যাস লংতরাই: কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

[সাধারণভাবে উপন্যাস বলতে কী বুঝি: উপন্যাস বলতে আমরা বুঝি আধুনিক মানবজীবনের আখ্যান। সঠিকভাবে বললে, মানবজীবনের আধুনিক আখ্যান। পুঁজিবাদের বিকাশের সমান্তরালে আধুনিকতার উৎক্রম মানুষের মূল্যবোধ ও বস্তুজগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়। ফলত এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে মানবজীবনকে দেখা ও বোঝার প্রক্রিয়াতে। আর এই প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে জন্ম নেয় উপন্যাস, যা এই পরিবর্তমান সমাজ ও সভ্যতাকে নিজের মতো করে বর্ণনা করে। নিজের মতো করে ধারণ করে জীবনের জটিলতা, চরিত্রদের মনের রহস্য।

এই প্রক্রিয়াটি একঢালা নয়। অর্থাৎ, উপন্যাস কেমন করে জীবন ও জগতের বিবরণ দেবে, তার পদ্ধতি এক নয়। পদ্ধতির বৈচিত্র্যে তৈরি হয় নানা জাতের উপন্যাস। যখন বলব মহাকাব্যিক উপন্যাস তখন বোঝাই যায় জীবনের এক ব্যাপকতর পটভূমি জুড়ে উপন্যাস ফেঁদেছেন লেখক। যেখানে হয়ত এক দীর্ঘ সময় জুড়ে বহু চরিত্রের সমাবেশ আর বহু ঘটনার ঘনঘটা। আবার যখন বলছি উপন্যাসটি মনস্তাত্ত্বিক, তখন ঘটনা ছেড়ে চরিত্রদের মনের গভীরে উঁকি মারছে বিবরণ। ধরে-ছেনে দেখতে চাইছে আবেগ-অনুভূতির নানা রঙের খেলা। প্রথম ক্ষেত্রে আখ্যান যেন অনুভূমিক রেখায় মানবজীবনের তল্লাশি চালায়। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা যেন মাটি খোঁড়ে উল্লম্ব রেখায়। শুধু পদ্ধতি নয়, বিষয়বস্তুর দিক থেকেও আলাদা হতে পারে উপন্যাস। কোনও উপন্যাসে জোর পড়তে পারে রাজনৈতিক ঘটনাবলি, কোথাও সামাজিক বিষয়বস্তু, কোথাও আবার আঞ্চলিক যাপনের উপর। অর্থাৎ বিষয়বৈচিত্র্যেও আলাদা হয় উপন্যাস। কিন্তু পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর যাবতীয় বৈচিত্র্য সত্ত্বেও উপন্যাসের নিজস্ব এক কাঠামো রয়েছে, ছোটোগল্পের সঙ্গে তুলনায়, যাকে ইমারত বলাই সঙ্গত। এই ইমারতে, উপন্যাসভেদে তা-সে যত আলাদাই হোক না কেন, মূল গঠনটি সামান্য। উপন্যাসের এই মৌলিক গঠন সম্পর্কিত ধারণাটি আমাদের মনে এক আবছা সংস্কারের মতোই প্রচ্ছন্ন থাকে। এই সংস্কার আমরা সবসময় সচেতনভাবে আত্মস্থ করি না। বরং দেড়শো বছরের উপন্যাসপাঠের যে দীর্ঘ ইতিহাস, তারই সূত্রে এই সংস্কার উপন্যাস-পাঠকের সামূহিক চৈতন্যে ঠাঁই পায়। আমরা উপন্যাস সম্পর্কিত এই ধারণাকে প্রেক্ষাপটে রেখেই লংতরাই-এর বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা করব।]

এক। কাহিনির অন্তর্বয়নে শিথিলতা

উপন্যাসের কাহিনি সাধারণভাবে স্থান ও কালের বিস্তৃততর পরিসরে বিন্যস্ত হয়। ফলে কাহিনিটি আয়তনে অপেক্ষাকৃত বড় ও জটিল হয়ে থাকে। জটিল, অর্থাৎ কাহিনির মধ্যে নানা বাঁক থাকতে পারে। অথবা নানা উপকাহিনির সমন্বয়ে কাহিনিটি গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু বিস্তৃতি ও জটিলতা সত্ত্বেও উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে একটি অবচ্ছিন্ন প্রবাহ থাকবে যা সমস্ত বাঁক অথবা উপকাহিনির মধ্যে ঐক্য রচনা করবে। এই ঐক্যকে বলতে পারি কাহিনির অন্তর্গত সংসক্তি। *লংতরাই*-এ এই সংসক্তি দুর্বল। কাহিনির মধ্যে কোনও উপকাহিনি নেই কিন্তু একাধিক পর্ব রয়েছে। দুটি পর্বের মধ্যে রয়েছে এক-একটি বাঁক। উপরের সারণি অনুসারে পর্বের সংখ্যা সাত এবং বাঁকের সংখ্যা ছয়।[†] এই উপন্যাসে একটি বাঁকের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্বের সম্পর্ক সবসময় অনিবার্য নয়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী কাহিনির ঘটনা-পরম্পরার পরিণতিরূপে পরবর্তী পর্বের ঘটনার সূত্রপাত হয় না। তাই বাঁকবদল মসৃণ নয়, তা কাহিনির মধ্যে তৈরি করে অপ্রত্যাশিত ঝাঁকুনি। যেমন, উপন্যাসের শুরুতে জরকামুনি-সাজেরুঙের প্রেমের পর্বটি বর্ণিত হওয়ার পরেই কাহিনি মুখ ফেরায় রিয়াংদের প্রতিকূল যাপন-পর্বের দিকে। প্রথম পর্ব থেকে দ্বিতীয় পর্বটি যেন বিচ্ছিন্ন। কারণ প্রথম পর্বের ঘটনাক্রম দ্বিতীয় পর্বে সঞ্চারিত হয় না। প্রথম পর্বের অন্যতম প্রধান চরিত্র সাজেরুঙ দ্বিতীয় পর্বে সম্পূর্ণ অনুল্লিখিত। বস্তুত পরবর্তী তিনটি পর্বেই সাজেরুঙ অনুপস্থিত। এর ফলে একটি কাহিনির ধারাবাহিক বর্ণনা নয় লংতরাই কার্যত কয়েকটি পর্ব-কাহিনির সমবায় হয়ে ওঠে। যেখানে এক-একটি পর্বে এক-একটি বিষয়ের উপর জোর পরে। তদুপরি, গলাছড়া ও খেমুপাড়ার দুটি স্বতন্ত্র পটভূমির মধ্যেও কোনও ঘটনাগত সম্পর্ক নেই। উভয়ের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র জরকামুনি চরিত্রটি। নচেৎ দুটি পটভূমি যেন দুটি স্বতন্ত্র পৃথিবী। এই দুটি অংশ আলাদা গল্প হিসাবে বললেও আখ্যানগত কোন অস্পূর্ণতা থাকত না।

আসলে আধুনিক জীবনের আখ্যান হিসাবে উপন্যাসের কাহিনিতে যে সংসক্তি অপেক্ষিত, আদিম রিয়াং জনগোষ্ঠীর প্রাগাধুনিক যাপনের বর্ণনায় তা অনপেক্ষিত। আধুনিকতার যে যুক্তিবোধ উপন্যাসের

[†] এই পর্ব কাহিনির আলোচককৃত কাল্পনিক বিভাজন। আখ্যানকে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে এই বিভাজন।

খণ্ডকাহিনিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ রাখে তা রিয়াংদের জীবনে কোথায়! তাদের জীবনবোধে আনন্দ-সচ্ছলতা যেমন অলৌকিক শক্তির দান, বিপর্যয় তেমনই অতিপ্রাকৃতের রোষ। দুইয়ের পিছনেই কার্য-কারণ সম্পর্কের কোনও সমর্থন নেই। ফলে যুক্তির মতো জীবনকে ব্যাখ্যার কোনও ভাষ্য তাদের নেই। অর্থাৎ তাদের চৈতন্যে জীবনের ঘটনাগুলি যুক্তিহীন পরম্পরাতেই একের-পর-এক অভিনীত হয়ে চলে। আমরা দেখি মহামারীর মুখে খমুপাড়ার বাসিন্দারা খমুপাড়া ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। খমুপাড়া ছেড়ে নতুন কোনও জায়গায় তারা জীবন শুরু করতে চায়। এ-যেন একটি পর্বের সমাপ্তি। বিপর্যয়কে যুক্তিসংগত উপায়ে মোকাবিলা করতে না পেরে অসহায় রিয়াংরা একটি পর্বের আকস্মিক সমাপ্তি ঘোষণা করে ঢুকে পড়তে চায় জীবনের আরেকটি পর্বে। রিয়াং জীবনের এই আদিম-অসংলগ্ন দৃষ্টিভঙ্গিই যেন প্রতিফলিত হয় উপন্যাসের কাঠামোগত শৈথিল্যে, কাহিনির পর্বকেন্দ্রিক উপস্থাপনায়।

দুই। আখ্যানের অধিকেন্দ্রঃ গোষ্ঠীর দ্বারা স্থানচ্যুত ব্যক্তি

এই উপন্যাসের বিষয় এক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন। এখানে আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম কূটাভাসের কথা পেড়ে রাখা ভালো। উপন্যাস কার কথা বলে। অবশ্যই ব্যক্তিমানুষের জীবনের কথা। একজন (বা একাধিক) মানুষের জীবনকেই সবচেয়ে কাছ থেকে দেখবার চেষ্টা করে উপন্যাস। খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে সেই মানুষটার নিজস্ব জগৎ। কখনওবা তার চোখ দিয়েই দুনিয়া দেখার চেষ্টা চলে। একদিকে মানুষটার জীবনের ঘটনাবলি, অন্যদিকে তার চেতনার বিবর্তন – উভয়কেই ধরার চেষ্টা করে উপন্যাস। এই মানুষটাকেই আমরা বলি উপন্যাসের নায়ক অথবা কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপন্যাস কোনও মানুষের জীবনী হয়ে ওঠে না। উপন্যাস পাঠ সমাপ্ত হলে উপন্যাসকে কোনও বিশেষ চরিত্র নয়, সাধারণ মানবজীবনের বিবরণ বলেই মেনে নিই আমরা। একই সঙ্গে বিশেষ ও নির্বিশেষের এই দ্বৈততা উপন্যাসকে অন্য আখ্যানের তুলনায় বিশিষ্ট করে তোলে।

লঙতরাই-এ এই দ্বৈততা দুর্বল। অর্থাৎ, এই উপন্যাস যেন কোনও ব্যক্তিমানুষের আখ্যান নয়। ব্যক্তির বিশিষ্টতা এখানে দানা বাঁধে না। গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যই যেন প্রমুখিত হয়। অথচ এই আখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্র আছে। রিয়াং তরুণ জরকামুনি। জরকামুনি কেন্দ্রীয় চরিত্র কেন? কারণ তার জীবনকে অনুসরণ করেই এগোয় *লঙতরাই*-এর আখ্যান। এমনকী আপাতবিচ্ছিন্ন গলাছড়া ও খেমুপাড়ার দুটি স্বতন্ত্র পটভূমির মধ্যেও একমাত্র যোগসূত্র জরকামুনি। কিন্তু খেয়াল করে দেখলে ১ এবং ৫ সংখ্যক পর্বেই শুধু জরকামুনির গল্প শুনি আমরা। বাকি পাঁচটি পর্বে জরকামুনি নয়, মূলত রিয়াং জনগোষ্ঠীর গল্প শুনি আমরা। জরকামুনি উপস্থিত থাকে বটে, কিন্তু এই পর্বগুলিতে রিয়াংদের যাপনচিত্রই মুখ্য হয়ে ওঠে। এর কারণ, সারণির দিকে তাকালেই আমরা বুঝি ১ এবং ৫ সংখ্যক পর্বেই জরকামুনি সক্রিয়, বাকি পাঁচটি পর্বে নিষ্ক্রিয়। ৪ সংখ্যক পর্বে সক্রিয়তা পরোক্ষ, কোনও প্রত্যক্ষ বিবরণ উপন্যাসে নেই। এই নিষ্ক্রিয়তা শুধু কাজের নয়, চিন্তাজগতেরও বটে। ১ম পর্বে জরকামুনি মূলত প্রেমিক, ৫ম পর্বে দায়িত্বশীল সংসারী যুবক। কিন্তু কোনও পর্বেই তার কর্ম ও ভাবনার নিজস্বতা, ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় না। কোনও পর্বেই তার কর্মকাণ্ড ঘটনাবলির নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে না। যেমন দেখি ৩য় পর্বে হাসমাই রিয়াঙের উদ্যোগ ও উদ্যমে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টায়। এমনকী ৭ম পর্বের জরকামুনির জীবনের গতিপথ ভিন্ন খাতে বইয়ে দেয় হাসমাই। এই কর্মোদ্যম ও চিন্তার স্বাধীনতা জরকামুনির নেই। উপন্যাসজুড়ে কোনও বিশেষ ব্যক্তি নয়, নির্বিশেষ রিয়াং যুবক হিসাবেই সে যেন অভিনয় করে চলে। তাই এই উপন্যাসে ব্যক্তিকে ছাপিয়ে বয়ানজুড়ে ফুটে ওঠে জনগোষ্ঠীর বিবরণী। তার কারণও আছে। বস্তুত, আদিম জনগোষ্ঠীর প্রাগাধুনিক সমাজে ব্যক্তির মন অধিকার করে থাকে গোষ্ঠীচেতনা।

ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পরিসর সেখানে সংকুচিত।‡ ফলে উপন্যাসোপম নায়ক চরিত্রের বিকাশ, তার ঘটনাগত ও মানসিক সক্রিয়তা *লংতরাই*-এ অনপেক্ষিত। এটাই স্বাভাবিক যে, গোষ্ঠীর উদ্যোগ তথা যৌথচেতনাই সেখানে আখ্যানের কেন্দ্র অধিকার করবে। ফলে বিশেষ নয়, এই উপন্যাসের বিষয়বস্তুর কারণেই জোরটা পড়ে নির্বিশেষের উপর।

তিন। লোক-আখ্যানের প্রযুক্তি

বাংলা ভাষায় আখ্যান পরিবেশনের এক সমৃদ্ধ লোকায়ত ঐতিহ্য রয়েছে। যার পরিচয় আমরা পাই লোককথা, রূপকথা, গীতিকা, পটচিত্র, পুতুলনাচ প্রভৃতির মধ্যে। প্রাগাধুনিক সমাজের সৃষ্টি এই লোকসাহিত্যের গড়ন সহজ-সরল। উপরন্তু,মৌখিক বলে আধুনিক লিখিত সাহিত্যের করণকৌশলের জটিলতা এই রচনাগুলির অনায়ত্ত। যে জীবনের গল্প তারা বলে, সেটি যেমন সরল, পরিবেশনের শৈলীও অনুরূপ সারল্যে বিশিষ্ট। *লংতরাই* উপন্যাসের বয়ানেও এই সারল্যের রূপায়ণ লক্ষ করি আমরা। লক্ষণীয় গোটা আখ্যানটি একঢালা। অধ্যায় বা পরিচ্ছেদে বিভাজিত নয়। গল্প-বলার মৌখিক ঐতিহ্যের মতো যেন একটানা বলে যাওয়া।

এই ঢিলেঢালা বয়ানের মধ্যে প্রযুক্ত হয় লোকায়ত মন্ত্রতন্ত্র, প্রবাদ-প্রবচন, কিংবদন্তী, লোককথা ও লোকগান। লোকমন্ত্রে পুরোহিত সদ্যজাতের মঙ্গলকামনা করে সাত নদী আর সাত পাহাড়ের কাছে – 'হাঁটি হাঁটি পা পা চলন জানে না / সম্মুখে আবার ঢালু পাহাড়, আঙিনা ॥/ পিচ্ছিল পতনে কোলে নিও তারে / মুছে দিও তার ব্যথা সোহাগে আদরে ॥' ঘুমপাড়ানিয়া গানে মায়ের প্রার্থনা বুনো বিড়াল যেন খোকাকে না কামড়ায়, বনচিল যেন না আসে; বড় হয়ে খোকা যেন ঘর ভরা কাপাস আর ধান আনে। যুগ-যুগ ধরে পাহাড় ও অরণ্যের সঙ্গে রিয়াং জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক, অরণ্যকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসই যেন প্রতিফলিত হয় তাদের মন্ত্রে-গানে। প্রবাদ-প্রবচনেও দেখি আরণ্যক অভিজ্ঞতার ছায়া। কিংবদন্তী-লোককথার মধ্যে দেখি, যে অলৌকিক শক্তির কাছে তারা আত্মনিবেদন করতে চায় তারা, কখনও তিনি বনদেবতা বুড়াসা, আবার কখনও লংতরাই বাবা – দাঁতাল হাতি। সুতরাং রিয়াংদের জীবনচেতনার কেন্দ্র অধিকার করে থাকে পাহাড়-অরণ্যময় প্রকৃতি। আলোচ্য উপন্যাসে প্রকৃতি ও রিয়াংদের এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের রূপায়ণে অনিবার্যভাবে ব্যবহৃত হয় লোকসংস্কৃতির এই উপাদানগুলি। নিচের সারণিতে এই উপন্যাস থেকে দেখানো হলো লোকসাহিত্যের তেমনই কিছু উপাদান।

সারণি ২

সংরূপ	পর্ব	বিষয়বস্তু	মন্তব্য
লোকগান	১	কোন পাহাড়ের পাখী তুমি (জরকামুনি)	উক্তি-প্রত্যুক্তিময় প্রণয়গীতি। রিয়াং সমাজে প্রেমনিবেদনের রীতি
		অরহড় খেতের ফসল (সাজেরুঙ)	
		সব পাখি নীড় বাঁধে (জরকামুনি)	
		গোড়ালি যার ডিমের মত পাতলা (সাজেরুঙ)	
		তুমি ভয় পেয়ো না (জরকামুনি)	

‡ **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ একমাত্র হাসমাই চরিত্রটির মধ্যে লক্ষণীয়। সে অন্যদের মতো নিরক্ষর নয়। অবশ্য কীভাবে সে লেখাপড়া শিখল, আমরা জানি না। তার ব্যতিক্রমী চিন্তা, প্রতিবাদী মন, সংগঠনের শক্তিই বা কীভাবে তৈরি হল তার কোনও হদিস এই উপন্যাসে নেই। শুধু একটু বলা যায়, ভাবনার স্বাতন্ত্র্য, সাহস ও নেতৃত্বগুণ এই চরিত্রটির মধ্যে নায়কোচিত সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়।**

		ছড়ার জলের সঙ্গীহারা চাপিলা (জরকামুনি)	
	১	পুচ্ছ নাচানো চিংচং পাখী (জরকামুনি)	প্রেমের গান
	৪	নিদান দিনে হাওয়ায় দোলে (সাজেরুঙের পিসি)	খিদের জ্বালা ভুলতে গাওয়া গান
	৫	মনস্থির করে এগিয়ে যাও	বিয়ের গান
	৫	হাটু আর গোরালী (কৌরেঙফা)	আনন্দের গান
		ভালুক ভালুক ভালুক (কৌরেঙফা ও তার বউ গায়)	আনন্দের গান
	৬	ভাঙা কাসা ভাঙা পিতল	অচাই নপুকের স্মরণে সামফ্রি বাচানাম নৃত্যের সঙ্গে বিষণ্ন সুরে গানটি গীত হয়
	৬	মা শ্রীকালাক্ষী / নরম দুর্বাঘাসে চরণ তোমার	ইদীমাতার বন্দনা-সঙ্গীত। কৌরেঙফার মৃত্যুর আগে গীত
	৫	না ঘুমিয়ে থাকে না (সাজেরুঙ)	ঘুমপাড়ানি গান, ছেলের উদ্দেশে গীত
লোককথা	১	কাচকু রাজার রূপকথা (উধাবন রিয়াং)	নাতিনাতনিদের শোনায়
	২	ছাতিমগাছের আগাভাঙ্গা চূড়া নিয়ে রূপকথা	ঠাকুরমারা শোনায়
কিংবদন্তী	১	লংতরাইয়ের জঙ্গলে বনমানুষদের প্রেম ও বিরহের গল্প	তরুণ রিয়াং বিদ্যাজয় বাপ-ঠাকুরদার মুখে শোনা এই গল্পের কথক
	২	লংতরাই বাবার গল্প	বনদেবতা হাতির অলৌকিক আখ্যান
	৬	অচাই নাপুকের গল্প	উপকারী নাপুক মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে। রিয়াংদের প্রাণের দেবতা
প্রবাদ-প্রবচন	৩	বাঘ নাকি সকাল বেলা সূর্য প্রণাম করে বলে – প্রভু, দু'পায়া জন্তুর যেন দেখা না পাই।	মানুষের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কিত প্রবাদ। বনকর্মীদের অত্যাচার প্রসঙ্গে বিবৃত
	৫	ডিগা বাঁশ দিয়ে কি মাচা হয়।	জরকামুনির কাজের ক্ষমতা সম্পর্কে শাশুড়ির বিদ্রূপ
লোকমন্ত্র	৫	মা কাংসারি / পায়ে পায়ে আনন্দ মধুর (তলবাংহা)	রাংথাংহার বেইবুনামা (নবজাতকের মঙ্গলকামনার উৎসব) অনুষ্ঠানের মন্ত্র
	৬	যে অন্যায় করে প্রাণ হরণ করে/ তাকে অভিশাপ দিচ্ছি	কালো বুড়াসা দেবতাকে অভিশাপ দেওয়ার অনুষ্ঠানে উচ্চারিত মন্ত্র

তবে সর্বাপেক্ষা বেশি ব্যবহৃত হয় লোকগান। গান লোকজীবনের অপরিহার্য উপাদান। লোকধর্মের প্রধান অবলম্বন। লোকগানের মধ্য দিয়ে প্রাগাধুনিক গ্রামীণ জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার বাধাহীন প্রকাশ ঘটে। *লংতরাই*-এ আমরা দেখি রিয়াং-জীবনের প্রতিটি বাঁকে উৎসবে ও বিপর্যয়ে গান তাদের আত্মপ্রকাশের অনিবার্য মাধ্যম। প্রেমে-বিবাহে-সন্তানপালনের সময় রিয়াংদের গলায় যেমন গান ফোটে, বিপর্যয়-মৃত্যুকে তারা তেমনই গান গেয়ে উদ্‌যাপন করে। দেখার বিষয়, যুগ-যুগ ধরে রিয়াংদের কৌমজীবনের যে কাঠামো মোটের উপর তার কোনও পরিবর্তন হয়নি। ফলে তাদের জীবনের ঘটনাগুলি যেমন ফিরে-ফিরে আসে, তেমনই এক থাকে তাঁদের

আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশের রীতি। যেমন, রিয়াং যুবক-যুবতীর প্রেম যেমন সব যুগেই ফিরে-ফিরে আসে, তেমনই সেই প্রেম প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে উত্তরপুরুষের কণ্ঠে ফিরে আসে পূর্বজদের গান। আমরা দেখি, উপন্যাসের **১ম** পর্বে তিলের ক্ষেতে জরকামুনি ও সাজেরুঙ তাদের প্রণয় প্রকাশের ভাষ্য হিসাবে গান খুঁজে নেয় রিয়াং সংস্কৃতির ভাঁড়ার থেকে। অর্থাৎ, পুরোনো গান দিয়েই ঘটে নবীন প্রেমের আত্মপ্রকাশ। একইভাবে **৫ম** পর্বে সাজেরুঙ তার ঘুমপাড়ানিয়া গান নির্বাচন করে, কথকে কথা অনুসারে, রিয়াংদের ছেলেভোলানো গানের 'হাজার বছরের' ঐতিহ্য থেকে। বস্তুত, প্রেমে-উৎসবে-আনন্দে অথবা মৃত্য-বিপর্যয়-শোকে লংতরাই-এর সর্বত্র রিয়াং-হৃদয়ের প্রকাশ ঘটে সংগীতে ও গানে। গানের কথায় দেখি রিয়াংদের যৌথচেতনার সারল্য। যেমন, এই গানখানি – 'নিদান দিনে হাওয়ায় দোলে / লাল বাইকাঙ ফুল / যাবার পথে ক্ষুধার জ্বালা / কেউ দেখেনি তারে / ফেরার পথে মাথায় বোঝা / কেমনে মাথায় তুলি তারে?' জ্যৈষ্ঠের অভাবী দিনগুলিতে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখার অবকাশ কোথায়। জনগোষ্ঠীর এই বেদনাই যেন মুদ্রিত হয়ে আছে গানের কথায়। গানগুলি নিরাভরণ, অলঙ্কার বড়জোর উপমা। তাও উপমান চারপাশের পশুপাখি-অরণ্য থেকে সংগৃহীত। উপরের সারণি অনুসারে এই উপন্যাসে নয়টি উপলক্ষে গাওয়া হয় চোদ্দোটি গান। এছাড়া মাঝে-মধ্যেই শোনা যায় বিচিত্র আবেগের মূর্চ্ছনাবাহী কুসুমল ও সুমূলের সুর। এই গান তথা সংগীতের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে রিয়াং জনগোষ্ঠীর কৌম জীবনচেতনার নানা রূপ। আসলে, লোকসাহিত্যের এই উপাদানগুলি কাহিনির মধ্যে বিগর্ভিত করে কথকের বয়ানে অব্যক্ত রিয়াংদের আবেগ-অনুভূতি-বিশ্বাসের অমূর্ত স্বরকে। ফলত, *লঙতরাই*-এর লেখক লোক-আখ্যানের এই প্রথাসিদ্ধ উপাদানগুলির ব্যবহারে উপন্যাসের মধ্যে বিশ্বস্তভাবে ফুটিয়ে তোলেন লোকজীবনের অধরা আবহটি।

চার। আঞ্চলিকতা

কোনও উপন্যাসকে যখন আঞ্চলিক উপন্যাস বলে চিহ্নিত করি আমরা, তখন আসলে কী বলতে চাই। আঞ্চলিক-এর মধ্যে অঞ্চল রয়েছে। কিন্তু কোন অঞ্চল? অঞ্চল মানে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু। এ-সবই আছে কলকাতার। তাহলে কলকাতায় পটে লেখা উপন্যাস কী আঞ্চলিক উপন্যাস হতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। সাধারণভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে দূরবর্তী কোনও অঞ্চলের পটে লেখা উপন্যাসই আঞ্চলিক উপন্যাস। যেমন, বীরভূমের কোপাই নদী যেখানে হাঁসুলির মতো বাঁক নিয়েছে সেই প্রত্যন্ত কাহারপাড়ার পটে লেখা *হাঁসুলিবাঁকের উপকথা*। কিন্তু দূরবর্তী অঞ্চল হলেই কি আঞ্চলিক উপন্যাস হবে? *অরণ্যের দিনরাত্রি* উপন্যাসটি দাঁড়িয়ে রয়েছে কলকাতা থেকে বহুদূরে পালামৌয়ের অরণ্যময় প্রকৃতির মধ্যে। তাহলে কি সেটা আঞ্চলিক উপন্যাস? নিশ্চয়ই না। নয় কারণ এই উপন্যাসের মূল চরিত্ররা নাগরিক, কলকাতার বাসিন্দা। তার মানে শুধু আঞ্চলিক পরিচিতি, ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু দিয়ে কোনও উপন্যাস আঞ্চলিক উপন্যাস হয় না। সম্ভবত দূরবর্তী কোনও ভূ-প্রকৃতির পটে কোনও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনের গল্পই আঞ্চলিক উপন্যাসের উপজীব্য। কার তুলনায় প্রান্তিক? উপন্যাসের যে কল্পিত মধ্যবিত্ত-নাগরিক পাঠক, তার তুলনায় প্রান্তিক। এই প্রান্তিকতা যেমন আর্থ-সামাজিক, তেমনই সাংস্কৃতিক।

লংতরাই এই অর্থে খাঁটি আঞ্চলিক উপন্যাস। প্রথমত, আধুনিক সভ্যতার অভিকেন্দ্র থেকে বহু দূরে লংতরাই পাহাড়ের বুকে রিয়াং জনগোষ্ঠীর জীবন নিয়ে এই উপন্যাস। রিয়াংদের জীবন সম্পর্কে কথকের মন্তব্য: 'মানুষ, পাখী, গাছ-গাছালি সবই প্রকৃতির সন্তান। রূপে, রঙে আকারে প্রকারে। তবু তার মধ্যে এক অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা সমস্ত জীবন।' গলাছড়ায় রিয়াংরা ছিল অরণ্য-প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে, আর দুর্গম খমুপাড়ায় তারা পাহাড়ের ওপরে অরণ্যের একেবারে মাঝখানে। ফলে নিছক ভৌগোলিক বিচারেও রিয়াংরা একেবারে প্রান্তিক।

আর্থ-সামাজিক দিক থেকে তো বটেই। রিয়াংদের অর্থনীতি কৃষিকেন্দ্রিক। কৃষি বলতে আদিম জুম চাষ। রিয়াংরা চাষ করে মূলত ধান, কাপাস, তিল, মরিচ। আর করে শুয়োর ও মুরগীপালন। চাষের কাজ পুরোপুরি প্রকৃতিনির্ভর। চাষবাস ও পশুপালনে বছরভর রিয়াংদের জীবন চলে না। তাই হাত পাততে হয় মহাজনের কাছে। সরকারি সাহায্য অপ্রতুল। বরং ঘুষখোর সরকারি কর্মচারীদের অত্যাচারে নিরক্ষর, দুর্বল রিয়াংদের দুর্দশার শেষ নেই। ছোটো-ছোটো রিয়াং বসতিগুলি পাহাড়ের কোলে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। বসতির বাইরে পাহাড়ের গায়ে কোনও সমতল জায়গায় জঙ্গল কেটে জুম চাষের আয়োজন হয়। খেতের ধারে থাকে জুমিয়াদের বিশ্রামের টঙঘর – গাইরিঙ। একের চাষে অন্য সবাই সাহায্য করে। যৌথ চাষের এই বিনিময় প্রথাকে য়াক গুকসিম বলে। গ্রামে বাসিন্দাদের ঘর ছাড়াও থাকে অবিবাহিত যুবকদের একসঙ্গে থাকার টঙঘর – দোয়াইনক। যৌথ চাষ ও বাস – যূথবদ্ধতা আক্ষরিক অর্থেই আদিবাসী রিয়াংদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

উপন্যাসে দেখি, চাষ করতে গিয়ে প্রেমে পড়ে জরকামুনি ও সাজেরুঙ। রিয়াংদের মধ্যে বারোটি গোষ্ঠী। জরকামুনি বলসই আর সাজেরুঙ ওয়াইরেস গোষ্ঠীভুক্ত। যুবক-যুবতীর সহজ মেলামেশা ও প্রেমকে এই প্রাচীন জনগোষ্ঠী সম্মান করে। কিন্তু বিবাহ দুটি মানুষের বিষয় নয়, গোটা গোষ্ঠী সামিল হয় তাতে। ঘটক আন্দ্রারা নেয় মুখ্য ভূমিকা। বিবাহের পর জরকামুনিকে তিনবছর থাকতে হবে শ্বশুরবাড়িতে। প্রথাটির নাম 'জামাইখাটা'। শ্বশুরবাড়িতে সকলের খিদমত খাটতে হবে তাকে। সন্তানের জন্মের পর হয় নামকরণ। আমরা দেখি, জরকামুনি-সাজেরুঙের সন্তানের নামকরণেও অংশ নেয় গোষ্ঠীর সদস্যরা, শেষ পর্যন্ত নাম রাখে কুমায়ুক অর্থাৎ ধাই। এখানে বলে রাখা ভালো, রিয়াং সমাজ ও সংসারে পুরুষের তুলনায় মেয়েদের ভূমিকাটি ন্যূন নয়। বিবাহের পর সংসারের কাজে জরকামুনির সঙ্গে প্রায় একই রকম কায়িক শ্রম দেয় সাজেরুঙ। স্বাধীনতার বোধটিও মেয়েদের কম নয়। এই উপন্যাসে শাশুড়ি-বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়ার সময় ক্রুদ্ধ জরকামুনি যখন বলে, 'এক বৌ ছাড়লে কত বৌ (আছে)', তখন সাজেরুঙ সপাটে উত্তর দেয়, '(মা) বৌ ছাড়তে চাইলে ছাড়াছাড়ি করে দাও...মন যদি না যায়, জোরে আটকানো যায় না।' অবশ্য রোগ, মহামারী এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নিরক্ষর রিয়াংরা শরণাপন্ন হয় অচাই অর্থাৎ পুরোহিতের। উপন্যাসে দেখি অচাই তলবাংহা পূর্বজদের কাছে শেখা ভেষজ চিকিৎসা এবং তন্ত্রমন্ত্র-ঝাড়ফুঁকের শক্তিতে মোকাবিলা করে ব্যক্তিগত ও সামূহিক সমস্ত বিপদের। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্পর্শহীন রিয়াং জনগোষ্ঠীর চেতনা বিপর্যয়কে তর্জমা করে অতিপ্রাকৃত শক্তির রোষ হিসাবে।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রিয়াংদের এই আদিম যাপন আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে এই সরল জনগোষ্ঠীর মানুষকে ধারাবাহিকভাবে শোষণ করে চলে। একদিকে মালিক-মহাজনদের ব্যক্তিগত শোষণ অন্যদিকে প্রতিকূল সরকারি ব্যবস্থার সূত্রে রাষ্ট্রীয় শোষণ। এই উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে পাহাড়-জঙ্গলের অধিবাসী রিয়াংদের শাসন ও শোষণে জর্জরিত এক প্রতিকূল যাপনের কাহিনি। জরকামুনি সেই কাহিনির সূত্রধর। এই কাহিনিতে প্রান্তিক রিয়াংদের আর্থ-সামজিক জীবনের যে ব্যতিক্রমী গড়ন, তার কথা উপরে বলা হয়েছে। এই গড়নের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল: (ক) পাহাড়-জঙ্গলের প্রত্যক্ষ সংসর্গ (খ) আদিম অর্থনীতি (গ) প্রকৃতি-নির্ভরতা (ঘ) যৌথ জীবনচেতনা (ঙ) নারী-পুরুষের খোলামেলা সম্পর্ক এবং অপেক্ষাকৃত কম বৈষম্য (চ) সংস্কারাচ্ছন্ন চেতনা (ছ) বিনোদন-উৎসব-আনন্দে, এমনকী শোক-বিপর্যয়ে নাচ-গান-বাদ্যযন্ত্র প্রধান অবলম্বন। উপন্যাসে এই প্রান্তিক বিশিষ্টতার বিশ্বস্ত রূপায়ণ ঘটে রিয়াংদের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, প্রথা ও অভ্যাসের অনুপুঙ্ক্ষ উপস্থাপনায়। নিচের সারণিতে এই চিহ্নগুলির কয়েকটি উল্লিখিত হল:

সারণি ৩

বিষয়	চিহ্ন	পরিচয়
কৃষি	জুম	জঙ্গল পুড়িয়ে চাষের পদ্ধতি
	ঠপঠপি	মৃত্তিঙ্গা বাঁশের শব্দযন্ত্র। পাখি তাড়ায়
	ওয়াই আফফা	হাতে বাজানো ঠপঠপি
	য়ংসারুই	বনপতঙ্গ। বিকেলে ডাকলে জুমিয়াদের কাজে ছুটি
ঘরবাড়ি	গাইরিং	জুমের অস্থায়ী বিশ্রামঘর
	রিয়াংদের ঘর	ঘরের বাইরে বারান্দা বা সাংসি। ঘরের ভেতরে উনুন। উনুনের পাশে বসে রিয়াংরা তুলো ধুনে, বাঁশের হুঁকোতে তামাক খায়
	দোয়াইনক	গ্রামে যুবকদের রাত্রিবাসের ঘর
	ওয়াক রৌ	শুয়োর রাখার ঘর
	নকসাকচু	বাড়ির পাশে গাছের উঁচু ডালে তৈরি ঘর। বন্য হাতির উৎপাত থেকে বাঁচতে তৈরি
খাদ্য	মাইচু	পাতার মোড়কে বাঁধা ভাতের মচা
	লাঙ্গি	ঘরে তৈরি মদ
অনুষ্ঠান	কৌসুমবা ওয়াখাকাইর	বিবাহ-প্রস্তাব প্রদানকারী অনুষ্ঠান। ছেলের বাপ-মা ও আন্দ্রারা যায় প্রস্তাব নিয়ে কনের বাড়ি। মাথায় পাগড়ি। সঙ্গে কাছিম শিকারের বল্লম আর দা। আর থাকে মদ
	সুইখেমোর	বিবাহ
	বেবুইনামা	নবজাতকের মঙ্গলকামনার অনুষ্ঠান। নদী ও পাহাড়দের স্তুতি
প্রথা ও রীতিনীতি	য়াক গুকসিম	যৌথ চাষের বিনিময় প্রথা
	হ্রেষা ধ্বনি	আদিমতম ভালোবাসার প্রতীক
	সুইখেমোর পদ্ধতি	বিবাহসভায় ছেলের সঙ্গে মেয়ের বক্ষ-আবরণীর বিয়ে
	মৃত্যুর পর বাদ্যযন্ত্র	মৃত্যুর পর সারারাত ধরে ঢোল, বাঁশী বাজে
বিশ্বাস ও সংস্কার	য়ং চরিঙের (বনপতঙ্গ) ডাক	তিল-কাপাস ফোটার সময় হয়েছে
	চিংচং পাখির বাসার উচ্চতা	বোঝা যায় সেই বছরে বর্ষা প্রবল না দুর্বল
	আয়ুন মাইয়ের (বনপতঙ্গ) ডাক	দুর্ভিক্ষের বার্তা বহনকারী
	বুড়াসা	বনদেবতা
	লংতরাই বাবা	বুনো হাতি, বনের দেবতা
	সুইখেমোতে পাঁঠার মাংস	বিয়েতে পাঁঠার মাংস অমঙ্গলকারী
	চাপিলা মাছের তাৎপর্য	নবদম্পতি মাছ ধরতে গিয়ে বেশি করে চাপিলা মাছ পেলে দাম্পত্য জীবন সুখের হয়

	সদ্যজাতের নাভির ফুল	বাঁশের খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখে। বেশি উঁচুতে ঝোলালে নবজাতকের জীবনে তুফান এবং নিচে ঝুলিয়ে পিঁপড়ে ধরলে সে চর্মরোগে ভুগবে।
	কাঁচা হলুদ, ভাঙা ঝাড়ুর কাঠি খোপায় গোঁজা	বুড়াসা দেবতার কুনজর এড়ানো যাবে
	স্তনের প্রথম দুধ	বুড়াসাকে নিবেদন করলে কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পায় নবজাতক
	সিমালুং নক	শ্মশান ঘর। মৃতের প্রাণ যেখানে বিশ্রাম করে।
	চারজন আদি অচাই	বনদেবতা বুড়াসার চার অবতার। লিককাই (গুণজানা অমঙ্গলকারী), সুনথা (কুৎসিত), লুনথা (আঙুল-ঝরা বিকলাঙ্গ) ও নাপুকে (পরোপকারী)
	লাউতাউ	মৃত্যুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দেবতা। নাপুকের অন্য নাম। মৃত্যুর পর লাউতাউকে খুশি করতে হয়
	রাতদুপুরে মুরগির ডাক	মৃত্যুর বার্তা বহনকারী
বিনোদন	কুসুমল	পাহাড়ি বাঁশি
	চমপ্রেঙ, সুমূল, খাম	পাহাড়ি গিটার, বাঁশি ও পাহাড়ি মাদল
	বানরগিলা গাছের গোটা	শিশুদের খেলার সামগ্রী
	লাঙ্গি খেয়ে নৃত্য	ঘরে তৈরি মদ খেয়ে মাদল বাজিয়ে গান এবং ঘুরে-ঘুরে নাচ
	সামফ্রি বাচানাম নাচ	যুদ্ধের বাজনার সঙ্গে নাচ। মৃত্যুবিরোধী লাউতাউকে খুশি করার নাচ
আসবাব ও তৈজসপত্র	খাড়া	পিঠে ঝোলানো বেতের পাত্র
	চেঙপাই	মেয়েদের কাপড় বোনার যন্ত্র
	পতা	মদ খাওয়ার বাঁশের চোঙ
সাজসজ্জা	সিরিং	বাঁশের চিরুনি
	মালা	বুনো রামকলার বিচি দিয়ে গাঁথা মালা
	আসু গাছের শিকড়ের রস	কাপড় রাঙায় রিয়াং মেয়েরা

এছাড়া লোককথা, কিংবদন্তী, প্রবাদ-প্রবচন, মন্ত্রতন্ত্রের যে উল্লেখ এই উপন্যাসে দেখি, তার আলোচনা আমরা ইতিপূর্বেই করেছি। করেছি রিয়াং জীবনের প্রতিটি পর্বের সঙ্গে অনুপুঙ্ক্ষে জড়িয়ে থাকা গানের আলোচনা। লোকসংস্কৃতির এই উপাদানগুলির প্রয়োগে রিয়াংদের ব্যতিক্রমী যাপনের আন্তরিক ছায়াপাত ঘটে উপন্যাসে। ফুটে ওঠে অরণ্য প্রকৃতির মধ্যে লালিত এক আদিম জনগোষ্ঠীর সেই মনটি যা সরল আবেগে প্রাণবন্ত, সংস্কারের চাপে ভীরু, বাহ্যিক প্রতিকূলতার সামনে নিরুপায়। ঘরবাড়ি, পেশা-জীবিকা, সংসার-ধর্ম, বিনোদন প্রভৃতি সংক্রান্ত রিয়াং ভাষার অজস্র শব্দ উপন্যাসের বয়ানে বিগর্ভিত করে কথক। এমনকী তুলে দেয় রিয়াং ভাষার লোকগান। সাধারণভাবে রিয়াং ভাষায় অদীক্ষিত পাঠকের চেতনায় এই শব্দ ও পঙ্‌ক্তিগুলি যে রসায়ন তৈরি করে, তার সূত্রে রিয়াং জীবনের বিশেষ আবহটি কিছুটা হলেও পাঠকের অনুভববেদ্য হয়ে ওঠে। বাংলা

উপন্যাসের ভাঁড়ারে উত্তর-পূর্ব ভারতের এহেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-অবলম্বী উপন্যাস হাতে গোনা। এই প্রসঙ্গে প্রফুল্ল রায়ের *পূর্ব পার্বতী* উপন্যাসটির কথা বলা যায়। কিন্তু লেখক বিমল সিংহ এই আদিবাসী জীবনের প্রত্যক্ষ অংশীদার। ফলে তাঁর আখ্যানে, তাঁর ভাষায় পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা এই অঞ্চল ও তার জীবন সফলভাবে ফুটে ওঠে।

সীমাবদ্ধতা

এই উপন্যাসের সীমাবদ্ধতাগুলিকে আমরা কয়েকটি ভাগে আলোচনা করতে পারি।

(ক) গঠনগত: প্রথমত, আমরা আগেই দেখেছি এই উপন্যাসের বয়ান সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত অখণ্ড। খণ্ড বা পরিচ্ছেদে বিভাজিত নয়। আমরা জানি সাধারণভাবে উপন্যাসে একই সময়-পর্বে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা ও দৃশ্যাবলিকে উপস্থাপিত করতে পরিচ্ছেদ-বিভাজনের প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেন লেখক। কিন্তু এই উপন্যাসে (সম্ভাব্য) ঘটনা বা দৃশ্যের (যেমন জরকামুনি ও সাজেরুঙ, জরকামুনি ও মা-বাবা, জরকামুনি ও বন্ধুবান্ধব, সাজেরুঙ ও বন্ধুবান্ধব, সাজেরুঙ ও পিসি) উপস্থাপনায় পরিচ্ছেদ অনুপস্থিত। ফলত একমুখী কাহিনি শুধু জরকামুনিকে অনুসরণ করে সামনের দিকে এগোয়। জটিলতাহীন আখ্যান লোককথাসুলভ সরল এক গড়ন লাভ করে। দ্বিতীয়ত, পরিচ্ছেদ বা অনুরূপ কোনও বিভাজন-প্রযুক্তি না থাকায় কাহিনি যখন বাঁক বদল করে তখন আকস্মিক পরিবর্তনের ঝাঁকুনি যে কাহিনির গায়ে লেগে থাকে তা আমরা আগেই দেখেছি। দেখেছি, কাহিনির ১ম পর্ব থেকে ২য় পর্ব অথবা ৬ষ্ঠ থেকে ৭ম পর্বে পরিণতি পথটি যুক্তিসিদ্ধভাবে মসৃণ নয়। এর ফলে আখ্যানটি কতগুলি পর্বের সমষ্টি হয়ে ওঠে।

(খ) কাহিনিগত: প্রথমত, সাধারণভাবে উপন্যাসের কাহিনি নানা উপকাহিনির সমন্বয়ে তৈরি হয়। উপকাহিনিগুলির মধ্যে থাকে এক অন্তর্লীন ঐক্য। এগুলি মূল কাহিনির পরিণতিকে সমানভাবে পুষ্ট করে। কিন্তু এই উপন্যাসের ১ম অংশের চারটি বিষয়কে চিহ্নিত করি আমরা: এক. ব্যক্তিগত প্রেম, দুই. নিষ্ঠুর প্রকৃতির সামনে গোষ্ঠীগত নিরুপায়ত্ব, তিন. সরকারি নিপীড়নজনিত যৌথ যন্ত্রণা ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ, চার. প্রথাগত চাষের ক্ষেত্রে মালিক-মহাজনের শোষণ ও বঞ্চনার গোষ্ঠীগত অভিজ্ঞতা। এই বিষয়কেন্দ্রিক ঘটনাবলিকে উপকাহিনি বলা বাড়াবাড়ি, কারণ তাদের সেই সম্পূর্ণতা নেই। আমরা তাদের নাম দিয়েছি পর্ব। এই পর্বগুলি রিয়াংদের জীবনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার গল্প বলে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে অন্তর্লীন ঐক্যসূত্রে সম্পূর্ণ এক কাহিনি গড়ে তুলতে পারে না। দ্বিতীয়ত, কাহিনির অন্তিম পরিণতিও আপতিক। পূর্ববর্তী ঘটনাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ, দু-বছর বাদে আসাম থেকে বাড়ি ফিরে এসে গলাছড়ায় জরকামুনি যে আমূল আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন দেখে, তা কী করে সম্ভব হল, তার কোনও হদিস কাহিনির মধ্যে নেই। রিয়াং জনগোষ্ঠীর দুঃখময় যাপনের ছবিকে যে বিশ্বস্ততায় আঁকেন কথক, তাতে করে এই পরিণতিকে তরল ইচ্ছাপূরণ বলেই মনে হয়।

(গ) চরিত্রগত: এটি এমন এক আখ্যান যেখানে চরিত্রের তুলনায় ঘটনাবলি বেশি গুরুত্ব পায়। এক কথায় চরিত্রের তুলনায় প্লটের গুরুত্ব বেশি। এই অবস্থায় গোটা উপন্যাসে একমাত্র জরকামুনি-ই চরিত্র হিসাবে গড়ে উঠবার অবকাশ পায়। প্রশ্ন হল কোনও চরিত্র উপন্যাসে কীভাবে চরিত্র হিসাবে গড়ে ওঠে। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও চিন্তার জগৎ কীভাবে পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়। উত্তর সহজ। দু-ভাবে চরিত্ররা উপন্যাসে গড়ে ওঠে। এক, চরিত্রদের সম্পর্কে কথকের ও অন্যান্য চরিত্রদের দেওয়া তথ্য এবং মূল্যায়ন দ্বারা। দুই, চরিত্রের নিজস্ব কাজকর্ম এবং সংলাপ দ্বারা। এই চার রকম কাজের জন্য চাই পরিসর। অর্থাৎ কথকের বক্তব্য এবং চরিত্রের কাজকর্ম ও কথাবার্তার জন্য বরাদ্দ থাকে উপন্যাসের কিছুটা অংশ। যত বেশি পরিসর, উপন্যাসে তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

লংতরাই উপন্যাসে জরমামুনি ছাড়া কোনও চরিত্রের জন্যই বরাদ্দ পরিসরের পরিমান বেশি নয়। একমাত্র জরকামুনিই সাতটি পর্বের সাতটিতে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত। সাজেরুঙ উপস্থিত তিনটিতে। জরকামুনির বাবা রংকারায় উপস্থিত দুটিতে। একটির বেশি দুটি পর্বে সংলাপ আছে সাজেরুঙ, বিদ্যাজয়, তসীরাম, রংকারায়ের। আর জরকামুনির সংলাপ আছে পাঁচটি পর্বে, যার মধ্যে ২, ৪ এবং ৭ সংখ্যক পর্বে সংলাপ সামান্যই, যেটুকু সংলাপ তা ১ ও ৫ সংখ্যক পর্বে সীমাবদ্ধ। এই হিসেব থেকেই বোঝা যায় চরিত্রায়ণের অবকাশ এই উপন্যাসে কেউই পায় না। যেটুকু মনোযোগ জরকামুনি পায় সেখানেও সে মোটের উপর নিষ্ক্রিয়। তদুপরি প্লট-কেন্দ্রিক আখ্যানে তার মানস-জগৎ আদৌ উদ্‌ঘাটিত হয় না। ফলে চরিত্রায়ণের দুর্বলতা উপন্যাসটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রাসঙ্গিকতা

সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অন্তত দুটি কারণে এই উপন্যাসটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, উত্তর-পূর্ব ভারতের জীবন আমাদের কাছে এখনও অনেকটাই অপরিচিত। সেখানকার আদিবাসী জগতের নিজস্ব যাপনবিশ্ব তো আরও অচেনা। এই উপন্যাস পাঠককে সেই অজানা জগতে প্রবেশের কিছুটা সুযোগ করে দেয়। দ্বিতীয়ত, পাহাড়ী বা আরণ্যক জনজাতিকে পাহাড়-অরণ্য থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা বর্তমান ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান সমস্যা। কখনও বহুজাতিক সংস্থা, কখনও প্রচ্ছন্নভাবে রাষ্ট্র স্বয়ং এই মানুষদের অরণ্য থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা করে। কখনও খনিজ সম্পদ আহরণের তাগিদে, কখনও অরণ্য রক্ষার নামে। অথচ যুগ-যুগ ধরে পাহাড়-অরণ্যের সঙ্গে এই মানুষগুলির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এই প্রকৃতি থেকে তারা যোগাড় করে তাদের বেঁচে থাকার রসদ। *লংতরাই* উপন্যাসে রিয়াংরা সে-কথাই বলে। ফলে, আধুনিক ভারতে অরণ্যবাসী জনজাতিদের অরণ্য থেকে উচ্ছেদের যে জ্বলন্ত সমস্যা, *লংতরাই* উপন্যাস তার কথা বলে। তদুপরি, কিছুটা খণ্ডিতভাবে হলেও সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের একটি সম্ভাব্য পথের ইঙ্গিতও দেয়।